কমপিউটার বদলাচ্ছে, ল্যাপটপ বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে মোবাইল ফোন, গুগল, ফেসবুক, টুইটারের মতো মাউসগুলোও। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসবের ব্যবহারকারীরা কতটা বদলাচ্ছেন? বাংলাদেশের অবস্থান থেকে এ প্রশ্নটা আমাদের মাঝে মাঝেই করতে হয়, তুলতে হয় নানা সমস্যার প্রসঙ্গও। কারণ, বাকি বিশ্বের উন্নয়নশীলদের কাতারে আমরা গিয়ে সময়মতো শামিল হতে পারি না। বিদেশের বা বৈশ্বিক উদ্দীপনামূলক খবরগুলো নিয়ে যখন আমরা পরিবেশনের উদ্যোগ নেই, তখন দেশের অবস্থাটাও আমাদের যাচাই করে নিতে হয়। এই যেমন হোয়াটস অ্যাপের খবরটাই ধরুন। অতি সম্প্রতি ৫০০ মিলিয়নের ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করেছে ম্যাসেজিং অ্যাপ্লিকেশন হোয়াটস অ্যাপ। কিছুদিন আগে ফেসবুক কিনে নিয়েছিল এই হোয়াটস অ্যাপকে। এখন এই সার্ভিসটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে ভারত, ব্রাজিল, মেক্সিকোর মতো দেশগুলোর মানুষ। রাশিয়ানরাও এখন দ্রুত ঝুঁকছে। তবে ভারত ও ব্রাজিলের নতুন প্রজন্মই হোয়াটস অ্যাপকে পৌঁছে দিয়েছে ৫০০ মিলিয়নের ল্যান্ডমার্কে। আর এরা প্রতিদিন ৭০০ মিলিয়ন ছবি ও ১০০ মিলিয়ন ভিডিও শেয়ার করছেন। সংখ্যার দিক দিয়ে হোয়াটস অ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ভারতেই ৪৮ মিলিয়ন আর ব্রাজিলে ৪৪ মিলিয়ন। খবরটি দিয়েছে হোয়াটস অ্যাপের অফিসিয়াল ব্লগ। এই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থানটাও জানার ইচ্ছে হচ্ছে যেকোনো পাঠকের। কিন্তু কোথাও এই সংখ্যাটা পাওয়া যাবে না। কারণ, আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার ও স্মার্টফোন বিক্রি বাড়লেও এর কার্যকর সুবিধাগুলোর ব্যবহার ঠিকমতো বাড়ছে না বলেই হিসাবটা কোথাও নেই।

বাংলাদেশের যেকোনো উদ্যমী আইসিটি বিশেষজ্ঞ কিংবা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা আশাবাদী কথা শোনালেও সাংবাদিকদের হাতে যে তথ্য আছে, তা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। নিশ্চয়ই বাংলাদেশে আইসিটির ক্ষেত্রে কিছু কিছু উন্নতি আছে। যেমন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে, স্মার্টফোন ব্যবহার করছেন শহরাঞ্চলের অনেক লোক। কিন্তু এই ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে কী কাজে– এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গেলেই পড়তে হয় বিপত্তিতে। আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা সুবিধাগুলোর ব্যবহার কিন্তু স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা ঠিকমতো করতে পারছেন না। একটা স্মার্টফোন হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে উঠলেও স্মার্টফোনের যে উপযোগিতাগুলো আছে, সেগুলোর ব্যবহার হচ্ছে না। গান বা এফএম রেডিও শোনা কিংবা কিছু সংবাদ বিষয়ক ওয়েব পেজ ব্রাউজ করা ছাড়া বেশিরভাগ স্মার্টফোন ব্যবহারকারী আর কোনো উপযোগিতাই খুঁজে পান না স্মার্টফোনের। এর প্রধান কারণ ভাষার বাধা। দ্বিতীয় কারণ প্রযুক্তি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান না থাকা। ডেস্কটপে বা ল্যাপটপে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর বেশিরভাগই খুব নিম্নমাত্রায় সার্ভিসগুলোকে ব্যবহার করেন। বিষয়টিকে কেউ কেউ সংস্কৃতিগত সমন্বয়হীনতা বলতে চান, বিনোদনের ক্ষেত্রটাও যে সঙ্কুচিত অর্থাৎ বলিউড পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, সেটাও অনেক ক্ষেত্রে প্রকটভাবেই ধরা পড়ে। গেম বা অন্যান্য বিনোদনমূলক বিষয় ব্যবহারেও দেখা যায় গতি, ঝুঁকি উল্লাসের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা বললে অনেকেরই উষ্মার উদ্রেক হয়। কিন্তু বাস্তবতা এটাই যে, এই পশ্চাৎপদতাই জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে, যার প্রভাব বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিসরের কর্মসংস্কৃতিতেও পড়ছে।

কিন্তু এর কারণ হিসেবে যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করা যায়, তা ভিন্ন একটি বিষয়, তবে বহুবার উত্থাপিত। মূলত শিক্ষাব্যবস্থায় অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতাকেই এ সমস্যার মূল কারণ বলে বিবেচনা করা যায়, যা বিশ বছর আগেও একই ধরনের ছিল। এই বিশ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, পরিবর্তন ঘটেছে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির, কারিকুলাম ও বিষয়গত নতুনত্বও অনেক এসেছে, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে ইংরেজি ভাষার সক্ষমতা ও প্রযুক্তিভীতি দূর হয়নি, জ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তাও সাধারণ মানুষ খুব একটা অনুভব করছে না। পরিলক্ষণ যেগুলো আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি তা হলো– বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি উদাসীন বা অনীহা তৃণমূল পর্যায় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং বিগত বছরগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আশঙ্কাজনক হারে কমেছে বিজ্ঞান পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এ ক্ষেত্রে ঝরে পড়া এবং মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয় পরিবর্তনের সংখ্যাও লক্ষণীয়। উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনীহা কেনো সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে বিচিত্র অবস্থা। শিক্ষামন্ত্রী নিজে যেমন তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো একটি স্কুলে তিনি দেখেছেন বিজ্ঞান বিষয়ে সেখানে শিক্ষার্থী মাত্র একজন, তার বিপরীতে শিক্ষক আছেন পাঁচজন। আর ভিন্ন চিত্রও আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। মূলত ব্যক্তির মাথা গুণে সমস্যাটার প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা যাবে না। কারণ গণিত ও ভৌত বিজ্ঞানের পাঠদানের মতো উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও এখন সমস্যা। ঢালাও এমপিওভুক্তি হয়তো এর প্রধান কারণ। প্রতিযোগিতাহীন নিশ্চেষ্ট অবস্থা বা মানসিকতা স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মানকে অবনমিত করেছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় অবশ্যই নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন, অত্যাধুনিক কমপিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি শিক্ষার নামে কিছু টার্ম মুখস্থ করানো এবং অপারেটিং সিস্টেমে যাওয়া আর ফিরে আসা শেখানো হয়, তাহলে তার কোনো উপযোগিতা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বুঝবেন কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে জ্ঞানভাণ্ডারের কোনো বিষয় থেকে শুরু করতে হবে। তার জন্য কোনো নম্বর বা পুরস্কার আছে কি না, পরীক্ষার জন্য কোনো বিশেষ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে কি না, এ বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট হয়নি। কিন্তু বিষয় মুখস্থ করা এবং অপারেটিং ধরনের কিছু টেকনিক্যাল জ্ঞান অবশ্যই কোনো উপযোগিতা বা কৌতুহল সৃষ্টি করে না। জ্ঞানের বিষয়ে কৌতুহল উদ্রেক করতে শিক্ষকদের অপারগতা বা অনীহা কমপিউটার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্য বিষয়গুলোর প্রতিও শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। জ্ঞানের বিষয়ে শিক্ষকের দৈন্য বা মানসিক ঘাটতি শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পীড়িত করে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। প্র্যাকটিক্যালের ক্ষেত্রে আপত: সহজ কৌশল ও নম্বর পাওয়ার জন্য নকলের আশ্রয় নেয়াটাকে বৈধ করে দেয়াও বিশ্বাসহীনতার সৃষ্টি করে। সম্প্রতি এভাবেই বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়টিকে একটি খেলো ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। এর থেকে কার্যকর কিছু পাওয়া যাবে এমন আস্থা কোনো শিক্ষার্থীরই প্রায় নেই। এ বিষয়ে শিক্ষকদের চেষ্টাও খুব একটা দেখা যায় না। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে মুখস্থ বিদ্যাকেই এখনও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। সৃজনশীল প্রশ্ন কমন ফেলার টেকনিকও তৈরি হয়ে গেছে, নোট বই এবং অবৈধ কোর্চিংও চলছে বিপুল বিক্রমে।

এর সাথেই আবার যুক্ত হয়েছে ইংরেজি নিয়ে সমস্যা। এমনিতেই তিন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি বৈষম্যমূলক হয়ে উঠেছে, তার ওপর সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ইংরেজিরভীতি আগের পর্যায়েই রয়ে গেছে। কারিকুলাম, সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি মূল্যায়নে ডিজিটাল পদ্ধতি কাজে আসছে কি না, সে বিষয়টিই প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়ছে তারাও মূলত জ্ঞানভিত্তিক কিছু শিখছে কি না, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ ক্ষেত্রে বহু এমপ্লয়ারই অভিযোগ করেন– তারা কাজের মতো উপযুক্ত লোক সহজে পান না।

এ ক্ষেত্রে বলার অপেক্ষায় রাখে না, বর্তমান যুগে যেকোনো কর্মক্ষেত্রেই সাধারণ জ্ঞানের সাথে সাথে ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ও কমপিউটার লিটারেসি খুবই অবশ্যিক হয়ে উঠেছে, এমনকি বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতকদের কাছ থেকে এ দুটো গুণ আশা করেন নিয়োগদাতারা, কিন্তু এই বিষয়টির সাথে প্রায়ই আপোস করতে হয় তাদের, ইনসার্ভিস ট্রেনিং ও প্রবেশনারি পিরিয়ডের সময়সীমা বাড়িয়ে একটা সুযোগ সৃষ্টি করে কর্মীদের যোগ্য করে তুলতে হয়।

এই বিষয়গুলো ছাড়াও আসলে আইসিটির যথাযোগ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং এই বিষয়টির পরিবর্তনশীলতার সাথে অভিযোজনের জন্য

ইংরেজি জ্ঞান একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নতুন যুগে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো ক্রমাগত আসছে, সেগুলোর চিত্তাকর্ষককে বিষয়গুলোকে অনুধাবন, উপলব্ধি ও ব্যবহার করতে হলে ইংরেজি জ্ঞান অতি আবশ্যিক। কর্মক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে টিকে থাকতে হলে, সাফল্য লাভ করতে হলে ইংরেজি জ্ঞান ছাড়া চলা অসম্ভব। দেশী বা বিদেশী যেকোনো বাণিজ্যেই ইংরেজি ছাড়া এ যুগে চলা অসম্ভব। আর প্রাথমিক ইংরেজি জ্ঞানটাও শিক্ষার্থীদের দিতে হবে ওই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েই। বহু আগে থেকেই এ দেশে ইংরেজ প্রবলিত ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতিতে সাধারণ মানের শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত ইংরেজি জ্ঞান পেত। কিন্তু এখন পদ্ধতিটা সহজ করতে গিয়ে একেবারেই ইংরেজি জ্ঞানহীন শিক্ষিত প্রজন্ম সৃষ্টি হয়েছে, যারা সাধারণ নির্দেশনামূলক বিষয়গুলো পর্যপ্ত অনুধাবন করতে অপারগ। সবচেয়ে বিস্ময়কর– আইফোন ও অ্যাপসের মতো বিষয়গুলোও থাকে তথাকথিত শিক্ষিতদের বোধগম্যের বাইরে। অবশ্যই এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্যা, কিছু শিক্ষার্থী অবশ্যই এর মধ্যে থেকেই ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এবং লক্ষণীয়ভাবে এরাই আইসিটিতেও দক্ষ হয়ে ওঠে কিংবা এদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করার কাজে আইসিটিকে ব্যবহার করতে পারে। বাণিজ্য অনুষদের কিংবা সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও অধুনা তাদেরই সাফল্যের হার বেশি, যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে ইংরেজি ভাষাটা আয়ত্ত করতে পেরেছে।

স্বাভাবিকভাবেই তাই দেশের ভেতরেই এখন একটা ডিজিটাল ডিভাইড তৈরি হয়েছে এবং এটা শুধু আইসিটি জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য নয়, মূলত ইংরেজি শিক্ষার অপ্রতুলতার জন্য। আর এ কারণেই নতুন যুগের বৈশ্বিক আইসিটিভিত্তিক সংস্কৃতি, যা কর্ম ও বিনোদনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার মধ্যেও একটা বিভাজন তৈরি করেছে।

এখন এটা খুব দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে, অতি বাংলাপ্রীতি বাংলাসাহিত্যের উন্মেষের যুগে সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগেও খুব একটা কাজে আসেনি, ভাব প্রকাশের সমস্যা এবং ইংরেজের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলাভাষার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য ইংরেজি, আরবি, ফারসি, গ্রাম্য বন্য সব ভাষায় শব্দগ্রহণের তাগিদ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। মনে রাখা দরকার, বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত আবার স্বজাত্যবোধেও উচ্চমার্গীয়। কাজেই ইংরেজি না শিখলেই স্বজাত্যবোধ বাড়বে এমন ধারণা অচল। বিশ্বের আরও অনেক মনীষীই নিজের ভাষায় সমৃদ্ধির জন্য অন্য সুবিধাজনক ভাষা শেখার পরামর্শ দিয়েছেন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ইংরেজি ভাষা এখনও আমাদের জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় এবং আইসিটির সঠিক ব্যবহারের জন্যও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন অপরিহার্য।

সম্প্রতি আমরা সরকারের এটুআই প্রোগ্রামকে বহুমুখীকরণ এবং নিম্নশ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক আইসিটি শিক্ষা প্রচলনের বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে তার প্রত্যয়ের কথা বারবার বলছেনও। কিন্তু আইসিটি শিক্ষা কার্যকরভাবে সার্বজনীন ততক্ষণ পর্যন্ত হয়ে উঠবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইংরেজি শিক্ষাও সার্বজনীন হয়ে ওঠে। জ্ঞানের রাজ্যে অনুপ্রবেশের প্রধান ও প্রাথমিক চাবিকাঠি হচ্ছে ইংরেজি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে কৌতূহল নিয়ে প্রবেশ করতে হলেও এর যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজস্ব আইডিয়া নিয়ে দাপট দেখাতে হলেও চাই ইংরেজি ভাষার সাবলীলতা।

আমাদের দেশে আইসিটিনির্ভর উন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরির জন্য আইসিটি এবং ইংরেজির যুগপৎ বুৎপত্তি প্রয়োজন। এই বিষয়টি কেনো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তার কারণগুলো অনুসন্ধান করে প্রতিবাদের ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না। আইসিটি নানা বিচিত্র প্রবণতা নিয়ে এগিয়ে চলছে, সবগুলোকেই আমাদের ধরতে হবে বা বাকি বিশ্বের সাথে সাথে এগিয়ে চলতে হবে, শুধু খবরগুলো পড়ে বা শুনে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না কজ

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com

GLbI †mB `ó evav...

(42 cô̂i ci)

ইংরেজি জ্ঞান একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নতুন যুগে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো ক্রমাগত আসছে, সেগুলোর চিত্তাকর্ষককে বিষয়গুলোকে অনুধাবন, উপলব্ধি ও ব্যবহার করতে হলে ইংরেজি জ্ঞান অতি আবশ্যিক। কর্মক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে টিকে থাকতে হলে, সাফল্য লাভ করতে হলে ইংরেজি জ্ঞান ছাড়া চলা অসম্ভব। দেশী বা বিদেশী যেকোনো বাণিজ্যেই ইংরেজি ছাড়া এ যুগে চলা অসম্ভব। আর প্রাথমিক ইংরেজি জ্ঞানটাও শিক্ষার্থীদের দিতে হবে ওই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েই। বহু আগে থেকেই এ দেশে ইংরেজ প্রবলিত ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতিতে সাধারণ মানের শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত ইংরেজি জ্ঞান পেত। কিন্তু এখন পদ্ধতিটা সহজ করতে গিয়ে একেবারেই ইংরেজি জ্ঞানহীন শিক্ষিত প্রজন্ম সৃষ্টি হয়েছে, যারা সাধারণ নির্দেশনামূলক বিষয়গুলো পর্যপ্ত অনুধাবন করতে অপারগ। সবচেয়ে বিস্ময়কর– আইফোন ও অ্যাপসের মতো বিষয়গুলোও থাকে তথাকথিত শিক্ষিতদের বোধগম্যের বাইরে। অবশ্যই এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্যা, কিছু শিক্ষার্থী অবশ্যই এর মধ্যে থেকেই ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এবং লক্ষণীয়ভাবে এরাই আইসিটিতেও দক্ষ হয়ে ওঠে কিংবা এদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করার কাজে আইসিটিকে ব্যবহার করতে পারে। বাণিজ্য অনুষদের কিংবা সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও অধুনা তাদেরই সাফল্যের হার বেশি, যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে ইংরেজি ভাষাটা আয়ত্ত করতে পেরেছে।

স্বাভাবিকভাবেই তাই দেশের ভেতরেই এখন একটা ডিজিটাল ডিভাইড তৈরি হয়েছে এবং এটা শুধু আইসিটি জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য নয়, মূলত ইংরেজি শিক্ষার অপ্রতুলতার জন্য। আর এ কারণেই নতুন যুগের বৈশ্বিক আইসিটিভিত্তিক সংস্কৃতি, যা কর্ম ও বিনোদনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার মধ্যেও একটা বিভাজন তৈরি করেছে।

এখন এটা খুব দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে, অতি বাংলাপ্রীতি বাংলাসাহিত্যের উন্মেষের যুগে সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগেও খুব একটা কাজে আসেনি, ভাব প্রকাশের সমস্যা এবং ইংরেজের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলাভাষার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য ইংরেজি, আরবি, ফারসি, গ্রাম্য বন্য সব ভাষায় শব্দগ্রহণের তাগিদ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। মনে রাখা দরকার, বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত আবার স্বজাত্যবোধেও উচ্চমার্গীয়। কাজেই ইংরেজি না শিখলেই স্বজাত্যবোধ বাড়বে এমন ধারণা অচল। বিশ্বের আরও অনেক মনীষীই নিজের ভাষায় সমৃদ্ধির জন্য অন্য সুবিধাজনক ভাষা শেখার পরামর্শ দিয়েছেন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ইংরেজি ভাষা এখনও আমাদের জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় এবং আইসিটির সঠিক ব্যবহারের জন্যও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন অপরিহার্য।

সম্প্রতি আমরা সরকারের এটুআই প্রোগ্রামকে বহুমুখীকরণ এবং নিম্নশ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক আইসিটি শিক্ষা প্রচলনের বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে তার প্রত্যয়ের কথা বারবার বলছেনও। কিন্তু আইসিটি শিক্ষা কার্যকরভাবে সার্বজনীন ততক্ষণ পর্যন্ত হয়ে উঠবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইংরেজি শিক্ষাও সার্বজনীন হয়ে ওঠে। জ্ঞানের রাজ্যে অনুপ্রবেশের প্রধান ও প্রাথমিক চাবিকাঠি হচ্ছে ইংরেজি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে কৌতূহল নিয়ে প্রবেশ করতে হলেও এর যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজস্ব আইডিয়া নিয়ে দাপট দেখাতে হলেও চাই ইংরেজি ভাষার সাবলীলতা।

আমাদের দেশে আইসিটিনির্ভর উন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরির জন্য আইসিটি এবং ইংরেজির যুগপৎ বুৎপত্তি প্রয়োজন। এই বিষয়টি কেনো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তার কারণগুলো অনুসন্ধান করে প্রতিবাদের ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না। আইসিটি নানা বিচিত্র প্রবণতা নিয়ে এগিয়ে চলছে, সবগুলোকেই আমাদের ধরতে হবে বা বাকি বিশ্বের সাথে সাথে এগিয়ে চলতে হবে, শুধু খবরগুলো পড়ে বা শুনে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না কজ